দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

ঢাকা শুক্রবার, ২১ মাঘ ১৪১৮, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২

সম্পদে ভরপুর পার্বত্য চট্টগ্রাম

প্রফেসর ড. এম আজিজুর রহমান

প্রাচীনকাল থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাগুলো অবহেলিত রয়ে গেছে। মানুষের মাঝেও নৈরাশ্য এমনভাবে জায়গা করে নিয়েছে যেটা প্রত্যাশিত নয়। বর্ণ, গোত্র, ধর্ম, শ্রেণী, অঞ্চল এবং লিঙ্গসহ সর্বত্র অসমতা ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষা, পেশা, অর্থনীতিসহ জীবন, জীবিকার ক্ষেত্রে এর ক্ষতিকর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ জন্য জনগণ তাদের ভাগ্য উন্নয়নে ব্যর্থ, যা পরবর্তীতে দেশের উন্নয়নে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। এ অঞ্চলের লোকগুলো মৌলিক সুযোগ-সুবিধা আরো বাড়াতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক এলাকা বেশ বড়। এ অঞ্চলটি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালী। যেমন- খাগড়াছড়ি তেল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদে ভরপুর। আমাদের দেশের বেশিরভাগ বনজসম্পদের উৎস পার্বত্য চট্টগ্রাম। পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান কক্সবাজার ও সুন্দরবনের পরেই। এখানে আছে অনেকগুলো খরস্রোতা নদী ও হাইওয়ে। যোগাযোগ সুযোগ-সুবিধাসহ প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশের একমাত্র ব্যাপক পাহাড়ি অঞ্চল। পাহাড়ি জেলা যেমন-খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি গঠিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে মায়ানমার, উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্বে মিজোরাম এবং পশ্চিমে চট্টগ্রাম জেলা অবস্থিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তন ১৩,১৮৪ বর্গকিলোমিটার যা বাংলাদেশের মোট আয়তনের ৯%। ১৯৯১ এর সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী ১.০৪২ মিলিয়ন বা ১০ লাখ ৪২ হাজার যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ০.৭৪%। বাংলাদেশের যেখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯৫৩ জন লোক বাস করে সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামে মাত্র ৭৯.০৪ জন। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাতে অনেকগুলো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাস। বাংলাদেশে বসবাসকারী ৪৫টি উপজাতির মধ্যে ১৩টি উপজাতি যেমন- বম, চাক, চাকমা, খেয়াং, খুমি, লুসাই, মারমা, মুরং, পাঙ্খো, রাখাইন, তঞ্চঙ্গ্যা; ত্রিপুরা-এর বসবাস পার্বত্য চট্টগ্রামে। এরা সবাই মঙ্গোলিয়ান রেসের। ঐতিহাসিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলার অংশ হলেও একসময় এটি আরাকান, ত্রিপুরা এবং তার পরে আবারও আরাকান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৬৬৬ সাল থেকে ১৭৬০ সাল পর্যন্ত এটি মোঘল শাসনাধীন ছিল। ১৭৬০ সালে এলাকাটির কর্তৃত্ব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যায়। ব্রিটিশরা ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করে একে ব্রিটিশ-ভারতের অংশে পরিণত করে। তারা এর নামকরণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম (চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস)। উঁচু-নিচু পাহাড় নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক এলাকা বিস্তৃত। সমতল ভূমির পরিমাণ কমের কারণে এটি চাষাবাদের উপযোগী নয়। কিন্তু এখানে প্রাকৃতিকভাবেই বন গড়ে ওঠেছে। পাহাড়ের দুধারে এবং ঢালে আদিবাসীরা বিভিন্ন শস্য যেমন-ধান, তুলা, তৈলবীজ, চা, কলা এবং আনারস চাষ করে যাকে বলা হয় জুমচাষ। মাদুর, ঝুড়ি এবং বস্ত্র তৈরি করা তাদের পেশা। এসব এলাকার অধিবাসীদের বানানো পোশাকই আমাদের কাছে বার্মিজ পোশাক নামে পরিচিত। ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক আয়তন বাংলাদেশের মোট আয়তনের ৯%। যদিও বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১% জনগণ এখানে বাস করে। জনসংখ্যা কম হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ প্রচুর। পাহাড়ি এলাকাগুলো গ্যাস, তৈল ও জ্বালানি উপাদানের উৎস হিসেবে সম্ভাবনাময়ী। ১৯৬৯ সালের পাকিস্তানের জাতীয় তেল কোম্পানি সিমুলার্জ গ্যাস ও তেলফিল্ড আবিষ্কার করে। অন্যান্য যেসব খনিজ উপাদান সচরাচর পাওয়া যায় তা হচ্ছে বালি, পাথর এবং কয়লা। পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীগুলো হচ্ছে- কর্ণফুলি, সাঙ্গু এবং মাতামুহুরী। যদি গ্যাস, বিদ্যুৎ ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় তাহলে নদীর দুই তীরে ছোট বড় শিল্প-কারখানার স্থাপনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম যেহেতু খরা এবং মরুকরণ থেকে মুক্ত তাই এ এলাকা শিল্পায়নের জন্যে উপযোগী। যেটা অন্যান্য এলাকার মত নয়। চন্দ্রঘোনা কাগজ কলটি স্থাপন করা হয়েছিল খরস্রোতা নদীপথ এবং বিদ্যুৎ, বাঁশ, কাঠ ও বেত সুলভ মূল্যে পাওয়ার কারণে। যদিও কৃত্রিমভাবে আমেরিকার আর্থিক সহযোগিতায় কাপ্তাই লেকে একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। এ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে আমরা দু'ভাবে উপকৃত হচ্ছি প্রথমত বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং দ্বিতীয়ত সুলভমূল্যে জলবিদ্যুৎ। এ বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ করে বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করছে। এ ছাড়া ক্রমবর্ধমানশীল মৎস্যখামার স্থাপনের মাধ্যমে অধিক মাছ উৎপাদন করে আমাদের দেশীয় চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি করেও আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবো। পার্বত্য চট্টগ্রামে পর্যাপ্ত ভূমি, নদীর সুযোগ-সুবিধা থাকার কারণে এখানে ক্ষুদ্র শিল্প, মৎস্যখামার এবং ডেইরি ফার্ম স্থাপন করা যেতে পারে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোর সার্বিক উন্নয়নের জন্যে। সেগুন, গজারি (গর্জন) এবং বেতের বনায়নের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এলাকার বাসা-বাড়ি ও ফার্নিচার বানানোর জন্যে কাঠের গুঁড়ি সরবরাহ করা যেতে পারে। এভাবে গৃহ নির্মাণের ব্যয়ভারও কমে যাবে। সমতল ভূমির লোকদের চাইতে পাহাড়িরা যথেষ্ট পরিশ্রমী। কম বিনিয়োগের কারণে এখানে উৎপাদন কম।

> *যখন বিনিয়োগকারীরা শান্তিপূর্ণ স্থান খুঁজে পাবে তখন তারা ওইসব এলাকার সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে উৎসাহিত হবে। এভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রাম যেমনি শিল্পে সমৃদ্ধশালী হবে তেমনি দেশও উন্নতি লাভ করবে।*

এখন সময় এসেছে সম্ভাবনাময়ী পার্বত্য চট্টগ্রামকে উৎপাদমুখী একটি অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলা। আর এজন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন হিসেবে আরো স্থলপথ ও নৌপথ নির্মাণ করতে হবে। নদীপথে মালামাল পরিবহনসহ যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো করার জন্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নদী ড্রেজিং করতে হবে। একই সাথে বনায়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পাহাড়ি, বাঙালি ও উপজাতীয়কে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্যে তাদের বাংলা, ইংরেজি ভাষা এবং কম্পিউটার ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান শিখাতে হবে। এটা করা যাবে সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরের উদ্যোগে ছোট বড় শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে।

এশিয়ার অন্যান্য মঙ্গোলিয়ানদের মতই পাহাড়িরা বলিষ্ঠ এবং যথেষ্ট পরিশ্রমী। উপজাতীয়দের মাথা থেকে জাতিগত বৈষম্যের ধারণা দূর করে তাদের মেধাকে কাজে লাগাতে হবে। পাশাপাশি তাদের শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসায়সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। পাহাড়িরা পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে যদি তারা দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, এটা আলাদা কোন অঞ্চল নয়। যখন বিনিয়োগকারীরা শান্তিপূর্ণ স্থান খুঁজে পাবে তখন তারা ওইসব এলাকার সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে উৎসাহিত হবে। এভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রাম যেমনি শিল্পে সমৃদ্ধশালী হবে তেমনি দেশও উন্নতি লাভ করবে।

লেখক ঃ উপাচার্য, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।